ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন

শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা

ভূমিকা

মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের অগ্রযাত্রার সূচনাপর্ব থেকেই শিশু বিষয়ক চলচ্চিত্রের নির্মাণ প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিশ্ব চলচ্চিত্রের জনক বলে খ্যাত লুমিয়ের ব্রাদার্স তাঁদের সিনেমাটোগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কারলগ্নে যেসব চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করেছিলেন তন্মধ্যে *Breakfast of a Child* (1895) এবং *Watering in the Garden* (1895) নামক চলচ্চিত্রগুলোকে শিশুতোষ শ্রেণির আদিতম নিদর্শন বলে বিবেচনা করা যায়। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র মাধ্যম ক্রমশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পর শিশুদের জটিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অবলম্বন করে পৃথিবীর বিখ্যাত অনেক নির্মাতা চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। উলেখযোগ্য এসব চলচ্চিত্রের মধ্যে চার্লি চ্যাপলিনের *The Kid* (1920), ডি-সিকার *Bicycle Theif* (1948), *ফ্রাসোয়া ক্রফোর Four Hundred Blows* (1959) সত্যজিৎ রায়ের *পথের পাচাঁলী* (১৯৫৫), *গুপি গাইন বাঘা বাইন* (১৯৫৫), *হীরক রাজার দেশে* (১৯৮০), *সোনার কেলা* (১৯৭৪), *জয় বাবা ফেলুনাথ* (১৯৭৮), ঋত্বিক ঘটকের *বাড়ি থেকে পালিয়ে* (১৯৫৬), তপন সিন্‌হার *কাবুলিওয়ালা* (১৯৫৬), রাজা সেনের *দামু* (২০০৬), আমির খানের *Taare Zameen Par* (2007), বিশাল ভরদ্বাজের *The Blue Umbrella* (2007), জাফর পানাহির *The White Balloon (1995)*, আব্বাস কিরোস্তমির *Khane-ye doust Kodjast?* (1987), মাজিদ মাজিদির *Children of Haven* (1999), *Father* (1999), বরিস রিৎসারেভের *Aladin's Magic Lamp* (1966), গেন্নাদি কাজানস্কির *The Snow Queen* (1966), পাভেল কাদোশ্রিকভের *The Snow Maiden* (1969), ক্যাটরিন লাউরের *Ruddi* (2006) (1966), ইমো ঝং-এর *Not One Less* (1999), যোয়ান ক্যারলস ক্রেমেটারের *Viva Cuba* (2005), ফ্রানজিসকা বাচের *Emil And The Detectives* (2000), কেনেথ ব্রাঞ্চের *The Little Magic Flute* (2006), জোয়েল ফারগেসের *Serko* (2006), প্রভৃতি অন্যতম। তাছাড়া 'ওয়াল্ট ডিজনী প্রডাকশন' শিশুদের বৈচিত্র্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অবলম্বন করে হাজার হাজার চলচ্চিত্র নির্মাণ করে যাচ্ছে। যদিও সেসব চলচ্চিত্রের অধিকাংশেই শিশু-কিশোর উপযোগী দৃশ্য সন্নিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের অনেকেই উদ্‌বিগ্ন।

বাংলাদেশ ভূখণ্ডে শিশু বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ ইতিহাসের ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৯৬৬ সালে। স্বাধীন বাংলাদেশেও কিছুসংখ্যক শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এ

শ্রেণির চলচ্চিত্রের তালিকা যে খুব দীর্ঘ নয় তার উলেখ বাহুল্য মাত্র। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির আর্থিক সহায়তায় ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নির্মিত শিশুতোষ চলচ্চিত্রের সংখ্যা ৪১টি। উলেখ্য, এসব চলচ্চিত্র আয়তন বা দৈর্ঘ্যের দিক বিবেচনায়ও যেন একেবারেই শিশু! কেননা উক্ত ৪১টি চলচ্চিত্রের মধ্যে মাত্র দুইটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের (পুরস্কার, ১৯৮০: ২.৩০মিনিট এবং বাংলা মায়ের দামাল ছেলে, ১৯৯৭ : ২.১০ মিনিট); বারোটির দৈর্ঘ্য ১০ মিনিট থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে এবং অন্যান্য সকল চলচ্চিত্রের দৈর্ঘ্য ৩৫ মিনিট থেকে ৭০ মিনিটের মধ্যে সীমিত। কিন্তু দুঃখজনক যে, এসব ছবি বাংলাদেশের শিশু-কিশোরদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রদর্শনের কোনো ব্যবস্থা শিশু একাডেমি কখনোই গ্রহণ করেনি। আবার শিশু একাডেমি ব্যতীত এফডিসি কেন্দ্রিক প্রচলিত ধারায় নির্মিত আমরা স্বল্পসংখ্যক শিশুপ্রধান যে কয়েকটি চলচ্চিত্রের সন্ধান পাই তাকে শিশুতোষ চলচ্চিত্রের স্বীকৃতি প্রদানে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত। নানারূপ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও *ডুমুরের ফুল* (১৯৭৭), *ছুটির ঘণ্টা* (১৯৮০), *অশিক্ষিত* (১৯৮০) প্রভৃতিকে বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে বলে আমাদের গবেষণায় প্রতিপন্নের চেষ্টা করা হয়েছে।

এদেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রে আমরা শিশু-কিশোর চরিত্রের উপস্থাপন দেখতে পাই ঠিকই কিন্তু শিশু-কিশোরের বৈচিত্র্যপূর্ণ মনস্তত্ত্ব সেখানে লক্ষ করা যায় না। আবার বৈচিত্র্যপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক বিষয় অবলম্বন করে এদেশে শিশু চলচ্চিত্র নির্মিত না হলেও বাংলাদেশের মূল বা বিকল্পধারার চলচ্চিত্রে শিশু এবং শিশু-কিশোরের উপস্থাপন কম নয়। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে উপস্থাপিত শিশু-কিশোর চরিত্রসমূহ এবং তার উপস্থাপন শৈলী বিভিন্ন সময়ে দর্শক মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে বলে জানা যায়। বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের বিভিন্ন উপশিরোনামে মুদ্রিত পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল থেকে উলিখিত প্রতিক্রিয়াসমূহের উদঘাটন ও বিশেষণ সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

প্রত্যেক সমাজেই শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ সাধন এবং নৃতাত্ত্বিক আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সংশিষ্ট সমাজের আর্থসামাজিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক এবং মানবিক-নৈতিকতা বিচারের মানদণ্ডে। আর ধারণা করা হয় প্রতিটি সমাজের সৃষ্টিশীল কৃষ্টিকলায় উপরোক্ত বোধসমূহের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাংলাদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমটি এর থেকে অনেকটাই ব্যতিক্রম বলে প্রমাণিত। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা আড়াই হাজারের বেশি। শিশুতোষ না হলেও এসব চলচ্চিত্রের এক বিরাট অংশে রয়েছে শিশু-কিশোর চরিত্রের নানারূপ উপস্থাপন। বিভিন্ন শ্রেণির চলচ্চিত্রে বিভিন্নভাবে শিশুদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। শিশুদের এরূপ উপস্থিতি অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার মানসিক সীমা অতিক্রম করে যায় বলে বিষয়টি আলোচনা, সমালোচনা এবং গবেষণার দাবি রাখে। আর এ সম্পর্কে

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আধেয় সংশিষ্ট যথেষ্ট গবেষণা জরুরি বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের শ্রেণিবৈচিত্র্য কম নয়। কিন্তু চলচ্চিত্র শ্রেণির পটভূমি বিবেচনায় লক্ষ করা যায় যে, এই মাধ্যমে শিশু-কিশোরের উপস্থিতি যেন অনেকটাই প্রাপ্তবয়স্কের ন্যায়। সাধারণভাবে দেখা গেছে চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রতিফলিত অনেক শিশুর আচার-আচরণ, সংলাপ-সংগীত, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতোই চালিত হয়ে থাকে যা শিশু মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টিকটুই শুধু নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে শিশু-দর্শকের মানসিক গঠন ও বিকাশের জন্য চরম ক্ষতিকারক।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই চলচ্চিত্র শক্তিশালী গণমাধ্যমরূপে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশেও গণমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষা, তথ্য, বিনোদন এবং বাণিজ্য এই ত্রিবিধ নৈয়ায়িক নিয়ামকের চাহিদা মিটিয়ে কখনো কখনো চলচ্চিত্র আবার শিল্প বা আর্টের নৈয়ায়িক দাবিটিও পূরণের মাধ্যমে জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এর অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। সুতরাং চলচ্চিত্র মাধ্যমটির সামাজিক গুরুত্ব যে অপরিসীম তার উলেখ বাহুল্য মাত্র। এরূপ সামাজিক গুরুত্ব আছে বলেই চলচ্চিত্রের পর্দায় প্রতিফলিত ইমেজ বা চিত্র প্রতিরূপসমূহের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিটি সমাজ-মানসের নীতি-নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এমন কি বাঙালির জাতীয় জীবনের অনুগামী দার্শনিক মূল্যবোধ ও আদর্শের নিরিখে নির্ণীত হওয়ার দাবি রাখে। দাবি রাখে প্রতিটি চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ও যৌক্তিক উপস্থাপনের প্রসঙ্গটিও। শ্রেণিভিত্তিক বিবেচনায় 'শিশুতোষ চলচ্চিত্র' ব্যতিরেকেও এদেশের অনেক চলচ্চিত্রে চরিত্র হিসেবে শিশুর উপস্থিতি ব্যাপক যা ইতিপূর্বেও ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ চলচ্চিত্রে আমরা শিশু ও কিশোরদের যেভাবে পর্দায় প্রতিফলিত হতে দেখি অর্থাৎ পর্দায় শিশু-কিশোরদের যে image আমরা দেখি তাতে আমাদের নৈতিক, সামাজিক এমনকি শিশু মনস্তত্ত্বের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে।

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের উলেখযোগ্য শিশুতোষ চলচ্চিত্রে শিশু চরিত্রের আলোকে এই মাধ্যমে শিশু কিশোরের উপস্থাপন তাদের মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক এবং শৈল্পিক পটভূমিসমেত বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশেষণের প্রয়াস আছে বলে আমাদের প্রত্যয়। ফলে আমাদের চলচ্চিত্রে শিশু-কিশোরের অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভও সম্ভব হয়েছে বলে আশা করা যায়। সকলেই স্বীকার করে যে, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। সুতরাং চলচ্চিত্রের মতো ব্যাপক একটি গণমাধ্যমে শিশু-কিশোরদের বিকৃত উপস্থাপন আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের নামান্তর। এমতো বিবেচনায় এদেশের চলচ্চিত্র মাধ্যমে শিশুর উপস্থাপন কতটুকু যথাযথ তার অনুসন্ধান জরুরি।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার নিরিখে শিশু-কিশোরদের আত্মপরিচয়ের সন্ধান, শিশু মনস্তত্ত্বের

সাধারণ পরিচয় প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভের পর চলচ্চিত্র মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের উপস্থাপন কতটুকু যথাযথ তার অন্বেষণ করা হয়েছে বর্তমান গবেষণায়। এ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধান চালিয়ে উত্তর স্বাধীনতাকালের বিভিন্ন দশকে নির্মিত নির্বাচিত কিছুসংখ্যক চলচ্চিত্রকে আধেয় নির্ধারণপূর্বক শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ে গবেষণায় মনোনিবেশ করা হয়েছে।

নির্বাচিত চলচ্চিত্রসমূহের পরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংশিষ্ট শিশু বা কিশোর চরিত্রের উপস্থাপন সংক্রান্ত তাদের ব্যাখা গ্রহণপূর্বক প্রদত্ত ব্যাখা ও শিশু-কিশোরের অধিকার বিষয়ক আমাদের সমাজের মনস্তাত্ত্বিক গ্রহণযোগ্যতার একটি তুলনামূলক রূপরেখা বিনির্মাণের প্রয়াসও প্রস্তাবিত গবেষণায় লিপিবদ্ধ করা হবে। প্রসঙ্গত চলচ্চিত্রের সংশিষ্ট দর্শকের অনুসন্ধান ও তাদের মতামত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগ্রহ এবং ব্যাখ্যা বিশেষণান্তে আলোচ্য গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

গবেষণার জন্য নির্বাচিত চলচ্চিত্রসমূহের মুক্তিকালীন প্রচারণা এবং চলচ্চিত্রের রিভিউ এমনকি দর্শক মতামতের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রত্যক্ষণ, প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ব্যাখ্যা-বিশেষণ এবং প্রকল্প পরিচালকের পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি সকলের সম্মিলনে 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা' শীর্ষক গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা থেকে চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, চলচ্চিত্র গবেষক ও শিক্ষার্থী বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশু-কিশোরদের উপস্থাপন প্রসঙ্গে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ধারণা লাভে সক্ষম হবেন বলে গবেষকের বিশ্বাস। উলেখ বাহুল্য যে, মনস্তাত্ত্বিকভাবেও তারা প্রভূত উপকৃত হবেন বলে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত আরো উলেখ থাকে যে, প্রকল্প প্রস্তাবকালীন 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি' শীর্ষক শিরোনামটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শক্রমে আংশিক পরিবর্তনপূর্বক 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা' শীর্ষক শিরোনামে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডক্টর মো. আমিনুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা

গবেষণার নমুনা নির্ধারণ সীমাবদ্ধতা ও গবেষণা পদ্ধতি

মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের থেকে সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রসমূহে শিশু-কিশোরদের উপস্থাপনাশৈলীকে শিশুতোষ মনোভঙ্গি ও নৈতিকতার আলোকে পর্যালোচনা বক্ষ্যমাণ গবেষণায় আমাদের নির্ণীত আধেয়। কিন্তু বাংলাদেশে এতাবৎ নির্মিত প্রায় ২৬০০১টি চলচ্চিত্রের অধিকংশেই শিশু-কিশোর চরিত্র কোনো না কোনোভাবে মুদ্রিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাকে বাহুল্যবর্জিত ও সুসমন্বিত রূপ প্রদান অনেকটাই দুরূহ। অপরদিকে, গবেষণা প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত সময়ের ব্যাপ্তি ছিল মাত্র চার মাস। সময়ের এই স্বল্পতার কারণে এবং তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে গবেষণা-আধেয়কে কেবল বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে স্থিত রাখা হয়েছে। উলেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে আধেয় বিশেষণের জন্য কেস স্টাডি হিসেবে চারটি শিশুতোষ চলচ্চিত্র নির্বাচন করা হয়েছে। এগুলো হলো : এক. *এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী*; দুই. *ছুটির ঘণ্টা*; তিন. *পুরস্কার* এবং চার. *দীপু নাম্বার টু*। কিন্তু আধেয় বিশেষণের জন্য সীমিতসংখ্যক চলচ্চিত্র নির্বাচন করা হলেও বাংলাদেশে নির্মিত শিশুপ্রধান বিশেষত শিশুতোষ চলচ্চিত্রের পূর্ণাঙ্গ পরিসংখ্যান সাল-ওয়ারি একটি তালিকার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে শিশুতোষ চলচ্চিত্রের একজন নির্মাতা এবং একজন অভিনেতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ বর্তমান গবেষণায় সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উলেখ থাকে যে, সার্বিকভাবে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বিশেষত শিশুতোষ চলচ্চিত্রের বিষয়ে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সাম্প্রতিককালের শিশু দর্শকদের একটি অভিমতও বর্তমান গবেষণায় অধীত হয়েছে। উলেখ্য, সময়ের ব্যাপ্তি দীর্ঘ হলে চলচ্চিত্র সম্পর্কিত এরূপ সাক্ষাৎকার ও মতামত গ্রহণের পরিসর আরো দীর্ঘতর করা সম্ভব হতো। একই প্রক্রিয়ায় সিনেমা হলে হলে গিয়ে 'টার্গেট অডিয়েন্স' অর্থাৎ শিশু-কিশোর দর্শকদের ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে তাদের মতামত সংগ্রহ ও কাঙ্ক্ষিত চলচ্চিত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করাও সম্ভব হতো। ফলে সত্যিকার অর্থে চলচ্চিত্র সম্পর্কে তুলনামূলক বেশিসংখ্যক শিশু দর্শকের একটি সুনির্দিষ্ট চাহিদার স্বরূপ উন্মোচন সম্ভব হতো বলে ধারণা করা যায়। আর এরূপ গবেষণা থেকে সমগ্রক হিসেবে শিশু-কিশোর দর্শকের চলচ্চিত্র সম্পর্কিত মূল্যায়ন এবং তাদের চলচ্চিত্র-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার সম্ভব হলেই গবেষণার উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হওয়ার

সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। যেহেতু সময় স্বল্পতার কারণে বিস্তৃত আকার ও আয়তনে তা করা যায়নি সুতরাং সেক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাটিকে পূর্ণাঙ্গ বলে বিবেচনা করবারও কোনো অবকাশ নেই। বরং নির্ণীত বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার এটি একটি সূচনা মাত্র।

বক্ষ্যমাণ গবেষণাটি গুণবাচক গবেষণা বা qualitative research-এর পর্যায়ভুক্ত। কারণ এ গবেষণায় গবেষকের পর্যবেক্ষণ ও গভীর উপলব্ধিজাত মতামত বা অনুসিদ্ধান্তসমূহ গবেষিত বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। গুণবাচক এরূপ গবেষণায় মূলত তথ্য হিসেবে সংখ্যাতাত্ত্বিক উপাত্তসমূহ সহায়ক তথ্যকৌশলরূপে সংগ্রহপূর্বক বিশেষণ করা হয়। প্রয়োজনভিত্তিক এবং বিষয় সংশিষ্ট কিছুসংখ্যক ঘটনা বা কার্যক্রমের ভিত্তিতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ কিংবা পর্যবেক্ষণ রীতিতে তথ্য সংগ্রহসাপেক্ষে বর্তমান গবেষণার উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। উলেখ্য, এ গবেষণায় মৌল আধেয়-সংশিষ্ট চলচ্চিত্র, চলচ্চিত্র-রিভিউ, চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা, শিশু-কিশোর শ্রেণির দর্শক, যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের নিজস্ব মনোভাব, প্রত্যাশা, বুদ্ধি, অগ্রাধিকার, সুপারিশ, সাফল্য, মতামত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বিবেচিত বলে এটি গুণবাচক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত।[২]

প্রসঙ্গ : বাংলাদেশের সমাজ, শিশু ও চলচ্চিত্র মাধ্যম

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে জন্মগ্রহণের পর থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে শিশু হিসেবে আইনি বৈধতা প্রদান করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত জাতিসংঘ প্রণীত 'লিগ্যাল ডেফিনিশেন'-এ উলিখিত আছে যে :

The United Nations Convention on the Rights of the Child defines as every human being below the age of 18 years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.[৩]

ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রবিশেষে আবার গর্ভাবস্থার ভ্রূণও শিশুর মর্যাদা প্রাপ্ত বলে গণ্য।[৪] কিন্তু ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, জলবায়ু, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা প্রভৃতির নিরিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিশুনীতিতে[৫] জন্মগ্রহণের পর থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সকলকে শিশু বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে জন্মের পর থেকে ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে শিশু হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া আছে। বিদ্যমান শিশুনীতির আলোকে বাংলাদেশের শিশুদের তিনটি শেণিতে বিবেচনা করবার রীতি প্রচলিত দেখা যায়। বয়সক্রম অনুসারে

এই শ্রেণি তিনটি যথাক্রমে :

এক. জন্মগ্রহণ থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত এই বয়সগ্রুপকে 'শিশু' বলে ধরা হয়

দুই. ছয় থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত এই বয়সগ্রুপকে 'বালক' এবং

তিন. দশ থেকে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত এই বয়সগ্রুপকে 'কিশোর' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৬]

বয়সভেদে শিশুর এইরূপ শ্রেণিকরণ যথার্থ মনে হলেও বর্তমান গবেষণার আধেয় হিসেবে 'শিশু' বলতে সামগ্রিক অর্থে 'শিশু, বালক ও কিশোর' সকলকে একত্রে 'শিশু' এবং কখনো কখনো 'শিশু-কিশোর' বলে একটি সমগ্রকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বয়সভিত্তিক শ্রেণিকরণের সূক্ষ্ম পার্থক্যকে গৌণরূপেই দেখবার অবকাশ পাওয়া গেছে। গবেষণার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিশুর বয়সভিত্তিক অবধারণমূলক বিকাশের পর্যায়সমূহও বিশেষণের আওতায় আনা প্রয়োজন, এই বিবেচনায় মনোবিজ্ঞানী পিয়েগেটের অবধারণমূলক বিশেষণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কারণ মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর বিবৃত এই অবধারণমূলক বিশেষণ অধিকমাত্রায় গৃহীত এবং স্বীকৃত বলে আমাদের ধারণা। একটি সারণির মাধ্যমে পিয়েগেট কর্তৃক শিশুর অবধারণমূলক বিকাশের বর্ণিত ধাপসমূহ[৭] নিম্নোক্তরূপে প্রতিপাদন করা হলো :

Stage	Approximate Age	Description
Sensorimotor	Birth to 2 years	Behavior suggests child lacks language and does not use symbols, or mental representations of objects in environment. Simple responding to the environment (reflexes) ends and intentional behavior such as making interesting sights last begins. Child learns to seek hidden objects (object permanence) and begins to acquire basics of language.
Preoperational	2 to 7years	Cild begins to represent world mentally, but thought is egocentric. Child does not focus on two aspects of situation at once (lack of conservation). Child shows animism, artificialism, immanent justice.

Stage	Approximate Age	Description
Concrete Operational	7 to 12 years	Child shows conservation concepts, can adopt viewpoint of others, can classify objects in series (for example, from shortest to longest), and shows comprehension of basic relational concepts (such as one object being larger or heavier than another)
formal Operational	12 years and above	Mature, adult thought emeges. Thinking seems charaterized by deductive logic, consideration of various possibilities before attempting to solve a problem (mental trial and error), abstract thought (for instance, philosophical consideration of moral principles), and forming and testing of hypotheses.

বাংলাদেশ বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহের একটি। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল বলেও বাংলাদেশকে আলোচনার স্বার্থে প্রতিপন্ন করতে দেখা যায়। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, অপরাপর অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের ন্যায় বাংলাদেশের শিশুরাও পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিনোদন ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়েই বেড়ে ওঠে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত এবং নারী-শিশুদের ক্ষেত্রে এরূপ নিরাপত্তাহীনতা বেশিমাত্রায় লক্ষ করা যায়। বলা হয়ে থাকে :

> বাংলাদেশে শিশুদের আনন্দে শৈশব কাটানোর সুযোগ খুবই সীমিত। বেশিরভাগ গ্রামীণ শিশু অল্পবয়সেই বাবাকে সাহায্য করতে কৃষিকাজে নিয়োজিত হয়। মেয়েরা নিয়োজিত হয় গৃহকর্মে। বস্তির ছেলেমেয়েদের নিজেদের, এমনকি পরিবারের জন্য রোজগার করতে হয়।[৮]

আর দেখা যায় যে, এসব করতে গিয়েই শিশুদের এক বিরাট অংশ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে এবং পরবর্তীকালে সারাজীবন সমাজ, রাষ্ট্র এমনকি পরিবারকে তাদের এই অশিক্ষা ও অশিক্ষাজনিত সকল কর্মকাণ্ডের ভার বহন করে চলতে হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রম আইনের[৯] অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও অনেক শিশুকে জীবিকার তাগিদে অবৈতনিক গৃহশ্রমসহ কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে কেবল অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় মজুরি খাটতে দেখা যায়। লক্ষ্য করলে উপলব্ধ হবে যে, বিনা পারিশ্রমিকের ঝুঁকিপূর্ণ এসব কাজে নিয়োজিত শিশুদের মালিকের সহানুভূতির পরিবর্তে

অকথ্য গালাগাল এবং শারীরিক নির্যাতনের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত 'অভিজ্ঞতা ও কারিগরি জ্ঞান লাভের' সুযোগ হয়তো বা কারো কারো ভাগ্যে ঘটলেও ঘটতে পারে। কিন্তু বাস্তবে অনেক শিশু-কিশোরের ক্ষেত্রে তা তিক্ত অভিজ্ঞতার বিশাল ভাণ্ডারই হয়ে থাকে। সমাজের চারপাশে ঘটমান এসব দৃশ্যাবলি শিশুর প্রতি আচরণে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষের পরিবর্তে রূঢ় এই বাস্তবতাতে আমরা সকলেই যেন দিন দিন অভ্যস্থ হয়ে পড়ছি। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ভূমিকাও উলেখ এবং বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে।

বাঙালির সহস্রবর্ষের দ্রোহ আর বিদ্রোহের ধারাবাহিক পরিণতির আধুনিকতম প্রকাশ ঘটে ভাষা আন্দোলন আর মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ এবং বিজয় অর্জনের মাধ্যমে। অনেক রক্ত, ত্যাগ, তিতীক্ষার বিনিময়ে পরাধীনতার পেষণ থেকে মুক্ত হওয়ার চেয়েও মুক্তির এই স্বাদ, স্বাধীনতার এই অহংকার কেবল বার্তমানের কার্যকলাপে প্রতিফলন ঘটালেই চলবে না একে উত্তর থেকে উত্তর প্রজন্মে বাহিত করার দায়িত্ব বা দায়ভাগও একালের সচেতন নাগরিককেই বহন প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থার ন্যায় সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ ও দেশপ্রেমের মৌল প্রেরণা সঞ্চারের মাধ্যমে আমাদের উত্তর প্রজন্মকেও শাণিত করতে হবে। না হলে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত অহংকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের দেশে মোট জনসংখ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশই শিশু। অথচ জাতীয় যে কোনো নীতিমালা প্রণয়নের সময় নীতি নির্ধারকদের মধ্যে শিশু স্বার্থের এবং একই সঙ্গে শিশুদের সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল থাকে। প্রচল সামাজিক আদর্শবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞান মনস্ক এবং সুস্থ রুচিসম্পন্ন আলোকিত মানুষ সৃষ্টির পথে শিশুর অগ্রযাত্রার পটভূমি যদি সমাজ করে দিতে না পারে তবে সে সমাজ একটি ব্যর্থ সমাজের পরিচয় নিয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই পাবে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় শিশু-কিশোরদের প্রতি এখন পর্যন্ত উদাসীনতা কম প্রদর্শিত হয়নি। যে কোনো খেয়ালের বশেই হোক আর অমনোযোগের কারণেই হোক শিশু-কিশোরের প্রতি আমাদের এরূপ উদাসীনতা এক অর্থে তাদের অকালেই হত্যা করবার শামিল। আমাদের বিবেচনায় তাই জহির রায়হানের মতো বলিষ্ঠ কণ্ঠে এখনই উচ্চারিত হওয়া উচিত : Stop Genocide. শিশুদের এভাবে তিলে তিলে মেরে ফেলবার মাধ্যমে সৃষ্টিশীলতাহীন, মেধা ও মননহীন সর্বোপরি ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রটিকে একটি অথর্ব রাষ্ট্রে পরিণত করবার অপকৌশল থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই যথাযথ দায়িত্ব পালন করা উচিত। উচিত হচ্ছে শিশুদের মধ্যে যোগ্য নেতৃত্ব, মেধা, মনন, নীতি ও নৈতিকতার বোধ জাগৃতির লক্ষে পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আর এ পদক্ষেপের অংশীদাররূপে চলচ্চিত্র মাধ্যম যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। শিশু-কিশোরদের প্রণোদনা, দেশপ্রেমের অঙ্গীকার, সৃষ্টিশীল কর্মে উৎসাহিতকরণ, তাদের

মনোজগতে সুনীতির সঞ্চার ঘটাতে চলচ্চিত্র সহায়ক মাধ্যম হিসেবে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে সেক্ষেত্রে শিশু চলচ্চিত্রের একটি মানদণ্ড থাকা অবশ্য জরুরি। শিশুতোষ চলচ্চিত্রের মান নির্ণায়ক উপাদানসমূহের অন্যতম শিশু-কিশোরদের পক্ষে সহজ বোধগম্য বিষয়, শিশুর উপলব্ধির সাপেক্ষে নন্দনবোধ সম্পন্ন উপস্থাপনাভঙ্গি, সমাজের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ প্রণোদনা প্রভৃতি অন্যতম। চলচ্চিত্রকে শিশু-কিশোরদের বিশ্বাসযোগ্য করে এবং উপরে বর্ণিত আদর্শিক বিষয়সমূহের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের সম্মুখে তুলে ধরা উচিত। What characterises a good children's film/programme considering children's own qualitative evaluation? শীর্ষক একটি ডাচ্ গবেষণায় প্রায় অনুরূপ বিষয়ের ফলাফল নিম্নোক্তভাবে উলিখিত হয়েছে :

> The term 'quality' appears repeatedly in connection with children's films and with television for children. Thereby the definition of quality quite often merely mirrors the term professionalism which includes aspects of film production (plot, equipment, editing, music etc.). Arguments regarding content which stand for quality are only marginally mentioned. One of those arguments is to keep the representation as close to children's reality as possible. But what is children's reality? Is it merely made up by traces of quality created by adults?
>
> In a Dutch research project Peter Nikken examined four assessment groups, among them the group of children and parents. Thereby quality criteria like comprehensibility, aesthetic quality, commitment, entertainment, harmlessness, credibility and presence of models for identification were worked out (cf. Nikken 1995/1999).[১০]

বাংলাদেশে বিদ্যমান জাতীয় শিশুনীতির আলোকে অবলোকন করতে গেলে লক্ষ করা যায় যে, উক্ত নীতিমালার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত 'লক্ষ ও উদ্দেশ্যে'র সঙ্গে বর্তমান

গবেষণাটি দূরান্বয়ী সম্পর্কে সামান্য হলেও সংগতিপূর্ণ। কারণ নীতিমালার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত বিভিন্ন বিষয়াবলির মধ্যে শিশুর নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গ স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয়েছে। এখানে উলেখ্য যে, শিশুর বেঁচে থাকবার অধিকার নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে তার স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং শারীরিক নিরাপত্তা বিধান; সার্বিকভাবে মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে তার শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধন; পারিবারিক পরিবেশের উন্নতি বিধানে পদক্ষেপ গ্রহণ; বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ সাহায্যের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; সকল জাতীয়, সামাজিক, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষার নীতি অবলম্বন এবং জাতীয়, সামাজিক বা পারিবারিক কর্মকাণ্ডে শিশুর আইনগত অধিকার প্রভৃতি সংরক্ষণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্পষ্টতই লক্ষণীয় যে, শিশুর নানারূপ অধিকারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হলেও উক্ত নীতিমালায় গণমাধ্যমের সঙ্গে বিশেষত যোগাযোগ মাধ্যমের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুদের অধিকারের বিষয়টি তীব্রভাবে উপেক্ষিত বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। গণমাধ্যম বা যোগাযোগ মাধ্যম শিশুর সার্বিক বিকাশে উলেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। বিপরীত প্রক্রিয়ায় উক্ত মাধ্যমের বিরূপ প্রভাবও শিশুর নৈতিক, মানসিকসহ সার্বিক বিকাশে চরম বিরূপ এবং নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বর্ণিত শিশু নীতিমালায় সে প্রসঙ্গের সবিস্তার ব্যাখ্যার অনুলেখ লক্ষ্য করা যায়। তথাপি, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ১৭ নম্বর অনুচ্ছেদে[১১] বর্ণিত বিষয়ের ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়। সেখানে উলিখিত হয়েছে :

> শিশুর শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্র গণমাধ্যমের কর্মকাণ্ড গুরুত্বের সাথে স্বীকৃতি দিয়ে শিশুর জন্য বিভিন্ন ধরনের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রাপ্ত তথ্য ও বিষয়বস্তু শিশুর সামনে তুলে ধরবে। বিশেষ করে সেসব তথ্য ও বিষয় যা শিশুর সামাজিক-আত্মিক কল্যাণ করবে এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ সাধন করবে। এই উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ :
>
> ক. অনুচ্ছেদ ২৯ এর ভাবধারার[১২] সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশুর সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের জন্য তথ্য এবং বিষয়কে গণমাধ্যমে প্রচারে উৎসাহিত করবে
>
> খ. ভিন্নমুখী সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য এবং বিষয়বস্তু প্রস্তুত, বিনিময় এবং প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করবে

গ. শিশুদের জন্য বই প্রণয়ন এবং প্রচারে উৎসাহিত করবে

ঘ. গণমাধ্যমকে সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত আদিবাসী শিশুদের ভাষাগত চাহিদার দিকে লক্ষ রাখার উৎসাহ দিবে।

ঙ. ১৩ অনুচ্ছেদ[১৩] এবং ১৮ অনুচ্ছেদের[১৪] বিষয়বস্তুকে মনে রেখে শিশুর জন্য অকল্যাণকর তথ্য ও বিষয়বস্তু থেকে শিশুকে রক্ষার জন্য যথাযথ দিক নির্দেশনা প্রণয়ন করাকে উৎসাহিত করবে।

যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা জানি মানুষ অনবরত তথ্যপ্রাপ্তি, জ্ঞান আহরণ এবং বিনোদন লাভের দ্বারা অন্তর্গত পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। উপলব্ধ যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একইসঙ্গে তার মনোভাব বা attitude-এরও পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক সুস্বাস্থ্যের জন্য বস্তুগত পারিপার্শ্বিকতার ন্যায় মাধ্যম অর্থাৎ যোগাযোগ পরিমণ্ডলের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ অন্যান্য সকল অভিজ্ঞতার মতো শৈশবের যোগাযোগ অভিজ্ঞতাও তার স্মৃতির ভাণ্ডারে দীর্ঘ দিন সঞ্চিত থাকে। উলেখ্য যে, আনন্দময় স্মৃতির দীর্ঘস্থায়িত্ব মানবের অভিজ্ঞতায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এজন্য শিশুর পারিপার্শ্বিক ও যোগাযোগ মাধ্যম হওয়া উচিত আনন্দময়, উচ্চাকাঙ্ক্ষি অভিলাষসমৃদ্ধ এবং অনুসন্ধিৎসু। স্মর্তব্য, আমরা নিজেদের অজান্তে হলেও মাধ্যম পরিমণ্ডলকে তো শিশুর কাছে শিক্ষকতুল্য ভূমিকায় আরোপ করেই রেখেছি। যার অন্তঃশীল অস্তিত্ব শিশুকে অনবরত সৃষ্টিশীল কর্মপ্রেরণায় মুখরিত করে রাখতে সক্ষম। আবার নেতিবাচক মাধ্যমের প্রভাব বলয়ে অন্তর্লীন রেখে শিশুকে হীন মানসিকতায় তার ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় করে তোলা মোটেই অসম্ভব নয়। যে কোনো সমাজেই শিশুর শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকার কথা নতুন করে উলেখের অবকাশ রাখে না। আমরা জানি :

> শিক্ষক যদি প্রাণহীন ও আনন্দহীন হন, তাহলে ছাত্রেরাও প্রাণহীন ও আনন্দহীন হয়ে পড়ে। এইরূপ নিরানন্দ পরিবেশে পঠন-পাঠন কার্যকরী হয় না, মনেও থাকে না। আবার শিক্ষক যদি রাগী ও বদমেজাজী হন, তাহলে শ্রেণিকক্ষে প্রায়ই প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রাণহীন শিক্ষকের কথা ছাত্রেরা ভুলে যায়, কিন্তু বদমেজাজী কুশিক্ষকের অনেক অনাচার ও অত্যাচারের কথা তাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকলেও শিক্ষার দিকটা ফাঁকাই থেকে যায়। পক্ষান্তরে উৎসাহী ও স্নেহপ্রবণ শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও প্রাণবন্ততার সৃষ্টি করেন। এরূপ অনুকূল পরিবেশে ছাত্রেরা উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে থাকে। এরফলে শিক্ষা যেমন

> সহজ হয়, পঠিত বিষয়ও তেমনি দীর্ঘদিন মনে থাকে। মোটকথা, স্মৃতিচর্চায় ছাত্রের অনুকূল মনোভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১৫]

এ প্রসঙ্গে আমরা শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের সংযোগহীনতার প্রশ্নটি উত্থাপন করতে পারি। আনন্দহীন শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে একদা রবীন্দ্রনাথও আক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর সেই আক্ষেপোক্তি নিম্নোক্তরূপে ধ্বনিত হয়েছে :

> আমরা যতই বি.এ. এম.এ. পাশ করিতেছি, রাশি রাশি বই গিলিতেছি, বুদ্ধিবৃত্তিটা তেমন বলিষ্ঠ এবং পরিপক্ক হইতেছে না। তেমন মুঠা করিয়া কিছু ধরিতে পারিতেছি না, তেমন আদ্যপান্ত কিছু গড়িতে পারিতেছিনা, তেমন জোরের সহিত কিছু দাঁড় করাইতে পারিতেছি না। আমাদের মতামত কথাবার্তা এবং আচার-অনুষ্ঠান ঠিক সাবালকের মতো নহে। সেইজন্য আমরা অতুক্তি আড়ম্বর এবং আস্ফালনের দ্বারা আমাদের মানসিক দৈন্য ঢাকিবার চেষ্টা করি। [...] বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা-কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি।[১৬]

সুতরাং ফলপ্রসূ শিক্ষার সঙ্গে গণমাধ্যমকে সংশিষ্ট করে শিশু-কিশোরদের কাছে পৌঁছাতে পারলে শিশুর মনন ও মেধা অনাগত দিনের সংকট মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে বলে আশা করা যায়। আর বর্ণিত মাধ্যম-সংশিষ্ট শিক্ষা অবশ্যই দেশকালের রুচি ও সংস্কৃতি-সন্নিষ্ট হলে শিশুমনে সেই শিক্ষার যে প্রভাব ক্রিয়াশীল হওয়ার সম্ভাবনা তার ব্যাপ্তিও হবে সুদূর প্রসারী সে কথা অনুমান করা যায়। অতএব শিক্ষা ব্যতিরেকেও বিনোদনের জন্য কোনো গণমাধ্যম যখন শিশুর সঙ্গে সংযোগ সাধন করে তখন সমাজের প্রচলিত নীতি-নৈতিকতাবোধকে ধারণপূর্বক যোগাযোগ প্রক্রিয়াটিকে নিষ্পন্ন করা কর্তব্য বলে আমাদের বিশ্বাস।

বাস্তবের রূঢ়তার যাবতীয় সংকট সত্ত্বেও গণমাধ্যমে বিশেষত চলচ্চিত্র মাধ্যমে শিশুর প্রতি অনৈতিক ও অমানবিক আচরণ এবং এসব আচরণের দৃশ্যাবলি দর্শকরূপী শিশুর সম্মুখে উপস্থাপনের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে মাধ্যমকর্মীদের প্রচেষ্টার পূর্বাপর অনুধ্যান বর্তমান গবেষণা প্রয়াসের কেন্দ্রীভূত বিষয় বলে গবেষক মনে করেন। আমরা জানি যে, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'-র প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই অমানবিক, অনৈতিক, অসামাজিক সংঘাত ও সাংঘর্ষিক কার্যকলাপের সংঘটনে তৎপর। তবু এ বাস্তব যত সত্যিই হোক না কেন এই নিষ্ঠুর-নির্মমতা শিশুর মানশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপন সুস্থ নীতিবোধের অন্তরায়। একদা নির্মম বলেই গ্রিক ট্রাজেডির মৃত্যু বা হত্যাদৃশ্য মঞ্চের নেপথ্যে সংঘটিত হয়েছে এরূপ তথ্যমাত্রই দেওয়া হতো। পাশ্চাতের দার্শনিক বিশ্বাসসমূহের

অন্তত একটি এই যে, মানুষকে সেসব ভয়ংকর দৃশ্য দেখানোর মাধ্যমে রক্তাপুত্তভাবে প্রভাবিত না করা। লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশের মূল ধারার চলচ্চিত্রে ঘটনার আকস্মিকতা, নির্মমতা এবং তীব্রতা সৃষ্টির জন্য পরিণত বয়সের নরনারীদের পাশাপাশি শিশুদের প্রতিও কঠোর আচরণ প্রদর্শন করা হয়। তাদেরকে ভয়ংকর অস্ত্রের সম্মুখে মৃত্যুভীতি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও রোমান্টিক দৃশ্য নির্মাণ করতে গিয়ে শিশু-কিশোরদের মুখে এমন সংলাপ এবং দেহভঙ্গিমার এমন আচরণ প্রদর্শনের প্রবণতা দেখানো হয় যা কেবল পরিণত বয়সের প্রেমিক-প্রেমিকাদের দ্বারাই সম্ভব। উলিখিত বিষয়াবলি ব্যতীত ফর্মুলা চলচ্চিত্রের বহুসংখ্যক উদাহরণ দেওয়া যাবে যেখানে কাহিনির বিন্যাসে স্বামী ও শিশু পুত্র-কন্যার সম্মুখে (সকলের হাত-পা বাঁধা অবস্থায়) স্ত্রীর ধর্ষণ দৃশ্যসহ ভয়ংকর নির্যাতনের বিচিত্র ধরনের দৃশ ধারণ করা হয়।[১৭] আবার চলচ্চিত্র কাহিনীর প্রোটাগনিস্ট চরিত্রকেও অনেক সময় শিশু-কিশোর চরিত্রের সম্মুখে এমন নিপীড়ন ও নির্যাতন করা হয় যা শিশুদের স্বাভাবিক মানসিক বিকাশকে ক্ষুন্ন করে। উপরন্তু, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের অবচেতন মনের গুপ্ত নেতিবাচক স্পৃহাকেও উস্কে দেয়। আবার কোনো কোনো চলচ্চিত্রে এরূপ কৌশলের মাধ্যমে উক্ত চলচ্চিত্রেই আমরা শিশু-কিশোর চরিত্রের ঋণাত্মক বিকাশ লক্ষ করি। অর্থাৎ শিশুমনে সঞ্চারিত প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাকে দর্শকের নিকট যৌক্তিক বলে প্রতিপন্ন করবার পরিচালকের চেষ্টা লক্ষ করা যায়। যেমন 'খুনের বদলে খুন, রক্তের বদলে রক্ত' ঝরানোর অভিপ্রায় এদেশীয় চলচ্চিত্র কাহিনির জনপ্রিয় এক পন্থা বা ফরমুলারূপে হামেশাই দেখা যায়। আমাদের বিবেচনায় এটি যে একপ্রকার ভ্রান্ত চলচ্চিত্রশৈলী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমরা জানি যে, কোনো সামাজিক ব্যবস্থাপনা ঐ সমাজের মানুষের কাজ করবার প্রক্রিয়া বা ধরন, কথা বলবার ভঙ্গি সমাজের প্রচল যোগাযোগ প্রক্রিয়া প্রায় নির্দিষ্টই করে দেয়। যেমন ধরা যেতে পারে যে, শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়ায়। প্রথম দর্শনে বয়স্করা সাধারণত যে ভাবভঙ্গিতে শুভেচ্ছা বিনিময় করে থাকে শিশুদের ক্ষেত্রে তা একেবারেই যেন ভিন্ন। এ রীতি সমাজ স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। বলা যায় এই সব নিয়মজনিত স্বভাব সামাজিকগণের উপর অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সংশিষ্ট সমাজব্যবস্থা আরোপ করে দেয়। এর ফলে এক ধরনের সেন্সরবোধ সকলের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে। সমাজবিচ্ছিন্ন একেবারেই স্বতন্ত্র কোনো আচরণ আমরা সহজে গ্রহণ করতে যেমন পারি না তেমন মেনে নেওয়াও অনেক সময় কষ্টকর মনে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যোগাযোগ প্রক্রিয়া সমাজব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে আবার সমাজব্যবস্থাও যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। উলিখিত যোগাযোগ সম্পর্কে সমালোচক বলেন :